



সংস্কার, সংবিধান ও রাষ্ট্রের চরিত্র প্রসঙ্গ

আলী রীয়াজ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের, কিন্তু তার তাগিদটা বেশ জোরেশোরে আলোচিত হতে শুরু করে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি থেকে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের এজেডাভুক্ত হওয়ার পর সংস্কারকে নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি শর্ত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, সংস্কারের ব্যাপারে ২০০৬ সালের প্রাথমিক ধারণা থেকে এখনকার আলোচনার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি মৌলিক এবং ভিন্ন ধরনের। ২০০৬ সালে অনেকেই বলছিলেন, আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ঢেলে সাজানো দরকার। স্পষ্টতই সংস্কারের ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এখনকার আলোচনায় তার পরিধি বেড়েছে— রাজনৈতিক দলগুলো যে কেবল তার অধিভুক্ত হয়েছে তা-ই নয়, বলা যায় এখন লক্ষ্যই হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের দায়িত্বটি সরকারের আওতাভুক্ত; সে বিষয়ে কোনো রকম বিতর্কের অবকাশ নেই। কেননা বর্তমান সরকার স্পষ্ট করেই বলেছে, তারা সেটি করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের ধারণা নিয়ে বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে। তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রায়ন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আধিপত্য খর্ব করা ও ভবিষ্যতে তার পথরুদ্ধ করা, দলের কর্মপদ্ধতি এবং আর্থিক বিষয়াদির স্বচ্ছতা তৈরি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের দলীয় পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টির অবসান, দলকে প্রচলিত আইনের আওতায় আনা, জনগণের কাছে দলের দায়বদ্ধতা তৈরি— এসব হচ্ছে সংস্কারের একেবারেই প্রাথমিক পদক্ষেপ। এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো পদক্ষেপই সংস্কার বলে বিবেচিত হতে পারে না। বাংলাদেশের যে কোনো রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলোর সবই অনুপস্থিত। ফলে দলগতভাবে সবার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ পদক্ষেপগুলো দ্রুত ও জরুরি ভিত্তিতে সম্পাদন করা। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এই সংস্কার বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কি-না এবং যদি তা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং অচিরেই ভেঙে পড়তে বাধ্য হবে। আমার ধারণা, এটা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে, এ সংস্কারের প্রাথমিক চাপটি দলের বাইরে থেকেই আসছে। এ নিয়ে লুকোচুরি নিরর্থক। দলগুলো স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের কাঠামো ও আচরণ পরিবর্তনে উৎসাহী হয়েছেন বলে দাবি করাটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। চাপটি বাইরে থেকে এলেও প্রয়োজন বা তাগিদটা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে। ফলে ভেতরে-বাইরের নিরর্থক বিতর্কের চেয়ে তার উপযোগিতা ও পদ্ধতি নিয়ে কথাবার্তা বলাই বেশি দরকার।

প্রশ্ন উঠেছে, এই সংস্কার এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি কে পর্যবেক্ষণ করবে? অর্থাৎ সংস্কার সম্পন্ন হলেও তা যে অনুসরণ করা হচ্ছে তা মনিটরিংয়ের দায়িত্ব বর্তাবে কার ওপর। এজন্যই দলের সংস্কার ও অন্যান্য রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কার সম্পর্কিত। উত্তরটা আসলে খুব কঠিন নয়, এজন্য দরকার নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে তৈরি করা, যাতে করে তার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়। যারা সংস্কারের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক দেখতে চান না; কিংবা বলেন যে, আইন করে সংস্কার হবে না— তাদের উদ্দেশ্যে নিয়ে সন্দেহান হওয়ার কারণ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিষ্ঠান, কিন্তু একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের অনুপস্থিতিতে এ বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন দুরূহ হবে। সম্ভবত অসম্ভবও হয়ে পড়তে পারে। নির্বাচন কমিশন এখন সরাসরি নির্বাহী বিভাগের আওতার মধ্যেই আছে এবং অন্তর্বর্তী সরকার তা আলাদা করতে পারছেন না বলেই মনে হয়। এর কারণ হলো সাংবিধানিক বিধি-বিধান।

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংবিধানের বিভিন্ন রকম বিধান নিয়ে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো মহল থেকে সংবিধান কমিশন গঠন করে এ ধরনের মৌলিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা

অত্যাৱশ্যক। সংবিধানের সেই দিকগুলোও চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন, যেগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূলে নয়। উদাহরণ হিসেবে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধান যে পটভূমিকায় এবং যে ধরনে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য রচিত হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তার ব্যাপক পরিবর্তনও ঘটেছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিপরীতে এককেন্দ্রীকরণই ঘটিয়েছে। আমরা ব্যক্তির শাসনই প্রত্যক্ষ করেছি— সামরিক, বেসামরিক, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের শাসনই চলুক না কেন তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির প্রস্তাব উঠেছে। সেটা বড়জোর একটি দিক বলা যেতে পারে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও সরকারের মধ্যে ভারসাম্য তৈরির জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যাবে? সাংবিধানিক যেসব প্রতিষ্ঠান ও পদ রয়েছে সেগুলোর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আদৌ আছে কি-না তা ভালো করে খতিয়ে দেখার বিকল্প কোথায়? সাংবিধানিক পদগুলোর জবাবদিহিতা না থাকলে কি পরিণতি হতে পারে তা কি গত পাঁচ বছরের জোট শাসনামলে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাইনি? সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত সরকারের নেই, এটাও সংবিধানেরই কথা। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর এ নিয়ে ভরসা করার কোনো উপায় নেই। তা হলে কি বাংলাদেশের মানুষের নিয়তি হচ্ছে এই বৃত্তচক্রে ঘুরপাক খাওয়া? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তা ঠিকঠাক করতেই কমপক্ষে বছরদশের লাগবে। প্রধান বিচারপতির মতো হলো, এর চেয়েও বেশি সময় দরকার। প্রশাসনের ব্যাপারে চিত্রটি উনিশ-বিশ মাত্র। উপায় বের করতে হলে দরকার উন্মুক্ত আলোচনা; কেবল সংবাদপত্রের পাতায়, গণমাধ্যমে নয়; দরকার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে অংশীদার করে এ ধরনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি। যত তাড়াতাড়ি সে কাজে অগ্রসর হওয়া যায় ততই ভালো।

রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের কথা উঠলেই বলা হয়, দেশে রাজনীতি এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে করে, গত ১০০ দিনে কোনো রাজনীতি নিয়ে আলোচনা তো বন্ধ থাকেনি। বর্তমান সরকার এ আলোচনাকে নিরুৎসাহিত করবে বলে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। রাজনীতি ঘরোয়া বা অন্য রকম করার সুযোগ আসা মাত্র নির্বাচনমুখী হয়ে পড়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে অস্থিরতা সেটাই প্রমাণ করে যে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার পরিণতি যে ভালো হয় না ১১ জানুয়ারির পরও যে রাজনৈতিক দল তা বুঝতে অনিচ্ছুক সেই দল যতই বলুক 'আমরা সংস্কারপন্থি' তা সত্য হতে পারে না। সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর প্রশ্নে আরো দু'চারটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার যে বিধান, তাতে করে সাংবিধানিক পদগুলো দলীয়করণে যে পথ রয়েছে তা বন্ধ করার জন্য কেবল শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করা আর সম্ভব নয়। সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা বিষয়ে ৬৭ অনুচ্ছেদের যে অপব্যবহার আমরা ১৫ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছি তাতে করে এ নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। এগুলো কেবলই উদাহরণ। নিঃসন্দেহে এ ধরনের আরো অনেক ধারাই রয়েছে। আর ত্রয়োদশ সংশোধনের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যে শেষ পর্যন্ত শুভফল বয়ে আনেনি, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এর কোনো বিকল্প ১১ জানুয়ারির পর আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলোচনায় একটা বিষয় সম্পূর্ণ অনুশ্লিখিত থেকে যাচ্ছে, তা হলো সংসদীয় এলাকাগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ। নির্বাচনী এলাকাগুলো নির্ধারণের পর একাধিক আদমশুমারি হয়েছে নির্বাচন কমিশনে কিন্তু তার কোনো প্রতিফলনই দেখা যায়নি। নির্বাচনী এলাকাগুলোর ভোটার সংখ্যার বিশাল তারতম্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ছোট নির্বাচনী এলাকাগুলো তাদের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী। এতে করে অবৈধভাবে ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া যথাযথ প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হয়ে আসছে অনেক দিন ধরেই। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর লুকোচুরি খেলার বিষয়টিও মনে রাখা দরকার।

রাজনৈতিক দলগুলোর আচার-আচরণের সঙ্গে সহিংসতার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সহিংসতা ও নিপীড়নমূলক আচরণকে এক ধরনের রাজনৈতিক বৈধতা দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন খুবই জরুরি। এর জন্য দুটিদিক মোকাবেলা করতে হবে। প্রথমত রাষ্ট্র যে সহিংসতা চালায় তার অবসান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবত বাংলাদেশ রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার জন্য সবসময়ই বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে এসেছে। ১৯৭২-৭৫ সালে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সময় এর সূচনা, কিন্তু ১৯৭৫-৯০ সময়ে সেনা-আমলাতন্ত্রের শাসনের সময়ই তা একটি স্থায়ী ব্যবস্থায় রূপ নেয়। ১৯৯১-০৬ সালের নির্বাচিত বেসামরিক শাসনামলে তার কোনো রকম মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি— দুঃখজনক হলেও তার সত্যতা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময়ে আইন-কানুন তৈরি করে এই ব্যবস্থাকে কেবল বৈধতাই দেওয়া হয়নি, এজন্য নতুন নতুন বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। তদুপরি প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণেই এটা স্পষ্ট যে, তারা জোরজবরদস্তিকে তাদের বৈধ অধিকার বলে মনে করেন। এর অবসানের জন্যই আইন-কানুনের পরিবর্তন দরকার এবং দরকার শক্তিশালী, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন

স্থাপন।

দ্বিতীয়ত সহিংসতা ও সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্তদের দায়মুক্তির ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে হবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাস্তানদের দায়মুক্তির পদ্ধতিটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান, সহজ ভাষায় তাদের দলীয় কর্মী বলে চিহ্নিত করা। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিগত তিনটি নির্বাচনে প্রধান দলগুলো মনোনয়ন প্রদানের সময় বিত্তশালীদের অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছে। তাদের সঙ্গে তাদের নির্বাচনী এলাকায় দলীয় কর্মীদের কোনো যোগাযোগ না থাকায় তারা মনোনয়ন লাভের জন্য এবং প্রচারাভিযানে প্রয়োজনে এমন ধরনের লোকজনকে জড়ো করছেন, যারা অর্থের বিনিময়ে ওই ব্যক্তির হয়ে কাজ করেছে। নির্বাচিত কিংবা ভবিষ্যৎ মনোনয়নপ্রত্যাশী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বহির্ভূতরা তাদের ওপর এমনভাবেই নির্ভরশীল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিপরীতক্রমে এসব মাস্তান চক্রই তাদের জিম্মি করে ফেলেছে এবং তার প্রভাব দলের ওপর পড়েছে অনিবার্যভাবেই। যে দল ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ মাস্তানদের দায়মুক্ত রেখেছে এবং প্রকারান্তরে অন্যদের উৎসাহিত করেছে। বিরোধীদলীয় এই মাস্তানদের রক্ষার জন্য দলীয় পরিচয় ব্যবহার করেছে। (সহিংসতা ও সন্ত্রাসের এই বৈধকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামপন্থি বলে কথিত রাজনৈতিক দলগুলো খুব সহজেই লাভবান হয়েছে। কেননা তাদের সুপরিচালিত সন্ত্রাসী তৎপরতাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে ধারণা দিতে তাদের কোনো রকম কষ্টই করতে হয়নি। এই রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিয়ে আমি এই রচনায় ইচ্ছেকৃতভাবেই কোনো আলোচনা করিনি)। রাজনৈতিক সংস্কারের আলোচনা এখন অবধি রাজনৈতিক দলের কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নে সীমিত থাকলেও সংস্কার প্রশ্নে অন্য বিষয়গুলো এড়ানো সম্ভব বলে মনে হয় না। সব বিষয়েই যে চটজলদি সমাধান পাওয়া যাবে এমন মনে করাও ঠিক নয়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারকে সামনে রেখে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপকতর কাঠামোটির দিকে তাকালে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে আলোচনার বিষয়টি আপনা আপনিই সামনে চলে আসবে। সেই বিতর্কের জন্য রাজনীতি করার সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।